Vol. 29 | No. 2 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুল ইসলামের উপন্যাস

Volume	29
Issue	2
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাইদুর রহমান ভুইয়া
Published online	February 1, 1986
DOI	10.62328/sp.v29i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i2.2
Pages	39-64
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নজরুল ইসলামের উপন্যাস

সাইদুর রহমান ভুঁইয়া

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রধানতঃ কবি ও গীতিকার রূপেই খ্যাত ও আলোচিত। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি কেবল কবিতা ও সংগীত রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। সংখ্যায় অল্প হলেও প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটকও তিনি রচনা করেছেন। ভাষার ঐশ্বর্যে, বিষয়ের নতুনত্বে ও বৈচিত্র্যে, শিল্পিক নৈপুণ্যে, সর্বোপরি সৃষ্টি-মাহাত্ম্যে এসব সাহিত্য-কর্ম তাঁর কবিতার মতই মাধুর্যমণ্ডিত[1] এবং তাঁর অশান্ত কবি-প্রতিভার বৈলক্ষণ্যে বিশিষ্ট ও অভিনিবেশযোগ্য। কিন্তু কাব্যশিল্পে তাঁর অভাবিতপূর্ব ব্যতিক্রমী প্রতিভার অসাধারণ ও অত্যুজ্জ্বল গৌরব এত প্রবল ও ব্যাপকভাবে প্রকটিত, যে, তাঁর উল্লিখিত সাহিত্য-কর্মের সার্থকতা পাঠক-সমাজে বহুলাংশেই অনবগত ও অনালোচিত।[2] কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বানুবৃত্তি-রহিত অক্ষয় ও অবিস্মরণীয় কবি-দৃষ্টি ও শিল্প-ভঙ্গির মতই তাঁর উল্লিখিত সাহিত্য-কর্ম, বিশেষ করে তাঁর প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের ক্রমোৎকর্ষের প্রেক্ষিতে একটা স্বতন্ত্র ও অভিনব বৈশিষ্ট্যে ও মহিমায় পর্যবেক্ষণযোগ্য। কিন্তু নজরুল-ভক্ত পাঠক ও সমালোচক তাঁর কাব্য-সম্পদ আলোচনায় এত বেশী অভিনিবিষ্ট যে তাঁর উল্লিখিত সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে একটা ব্যাপক, সূক্ষ্ম ও বস্তুনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ পেয়েছেন বলে মনে হয়না।

কাজী নজরুল ইসলাম রোমাণ্টিক কবি। বলাবাহুল্য, আধুনিক রোমাণ্টিক কবি-মাত্রই ভাব-প্রবণ, এবং কল্পনা-প্রসূত একটা অতীন্দ্রিয় ভাবাদর্শ, একটা পরম-সুন্দর তথা সত্য-বোধের চেতনায় অনুপ্রাণিত। জগৎ-জীবন সম্পর্কে অনুধ্যায় ভাবাদর্শের সত্য-স্বরূপই তার রোমাণ্টিক কবি-দৃষ্টি তথা কাব্যদর্শন এবং এ সত্য-স্বরূপের সানুরাগ শৈল্পিক প্রকাশই তার কাব্য-শিল্প। আধুনিক রোমাণ্টিক কবি তাঁর এই অন্তর্লীন

ভাবসম্পদকে কেবল কবিতায় রূপায়িত করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না ; প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি শিল্প-প্রয়াসেও তার প্রতিরূপ দর্শন অভিলাষী। রোমাণ্টিক কবি হিসেবে কাজী নজরুলও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার সুদূর সৌন্দর্য-লোকে একান্ত ভাব-সর্বস্ব কোন অলীক স্বর্গ-রাজ্য রচনার মত রোমাণ্টিক কল্পনা তাঁর ছিলনা। আধুনিক রোমাণ্টিক কবি-কল্পনায় এখানেই কাজী নজরুলের বৈলক্ষণ্য। বস্তুতঃ নজরুলের রোমাণ্টিক মন-মেজাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, বলা উচিত বিপরীত কোটির। নিরূপদ্রব রোমাণ্টিক স্বর্গরাজ্য রচনার জন্য যেরূপ পরম নিশ্চিন্ত মানসিকতার প্রয়োজন, দেশের কালিক পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং নজরুলের ব্যক্তি-সত্তার সংগঠন তার অনুরূপ ছিলনা। দেশ-কালের প্রচণ্ডতম অব্যবস্থিত, অস্থির, উত্তাল ক্রান্তি-কালের উদ্ধত অভিঘাতে বিক্ষত কাজী নজরুল ইসলামের প্রাচুর্যময় উচ্ছল-প্রাণ, দুরন্ত বলিষ্ঠ জীবন-সত্তার প্রচণ্ড, সম্বুদ্ধ মানবতাবাদ ও স্পর্ধিত স্বদেশ-প্রিয়তা-বিমিশ্র রোমাণ্টিক চেতনা ছিল প্রেম-সুন্দরের বিমূর্ত বিচ্ছেদ-বেদনায় নীল ; অবলুণ্ঠিত সত্য-সুন্দর-কল্যাণ তথা মানবাত্মার আর্তনাদে বিচলিত, বিষণ্ন ; উপেক্ষিত মানবতার হাহাকারে বিক্ষুব্ধ ; পরাধীনতার কলঙ্কে অশান্ত। তাই তাঁর কবিতা অশিব ধ্বংসের রোষে, সুন্দর সৃষ্টির উল্লাসে, সত্য আবাহনের আনন্দে এবং নিরুদ্দেশ বিমূর্ত প্রেমের বেদনায় বৈচিত্র্যময়, ঐশ্বর্যমণ্ডিত, গৌরবিত। কেবলমাত্র 'বিদ্রোহী' অভিধায় আখ্যায়িত করলে কাজী নজরুলের কবি-সত্তার প্রতি সুবিচার করা হয়না। বিদ্রোহ তাঁর সমগ্র কবি-সত্তার একটা উপ-উপাদান মাত্র। কাজী নজরুল বাংলা কাব্যের একমাত্র নীল-কণ্ঠ কবি। সমকালে মানবাত্মার অবমাননা-লাঞ্ছনার এবং বিমূর্ত প্রেম যাতনার সমস্ত বিষ-জ্বালা তিনি আপন কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। তাঁর কাব্য-দেবতা কল্পনা-লক্ষ্মী কিংবা সৌন্দর্য-লক্ষ্মী কিংবা বাণীদেবী নন। বাণী দেবীর বন্দনা তিনি করেননি। তিনি বন্দনা করেছেন সত্য-সুন্দর-কল্যা-ণের। তাঁর কাব্য-দেবতা নটরাজ রুদ্র। তাই তিনি নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-লোকে কোন স্বর্গ-রাজ্য বিরচনে প্রয়াসী ছিলেন না। অনাচারে-অবিচারে লাঞ্ছিত দুঃখ-দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট, বিরহ-যাতনায় সন্তপ্ত, পরাধীনতায় দলিত, প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতায় পিষ্ট ধূলা-মলিন লোক-জীবনের মাঝখানে কাজী নজরুল ইসলামের রোমাণ্টিক ভাবাদর্শের রাজ-সিংহাসন সংস্থাপিত। তিনি ছিলেন মানবপ্রেম সম্পর্কযুক্ত রোমাণ্টিক কবি,[৩] মানুষের অতৃপ্ত প্রেম-যাতনার

শিল্পদক্ষ রূপকার। আর এটাই তাঁর রোমাণ্টিক চেতনার স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব। তাঁর এ মানব-মুখী অভিনব রোমণ্টিক কাব্য-সংবেদের পরিচয় তাঁর প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটকেও সৃজনশীলতার বিচিত্র অনুষঙ্গে লক্ষযোগ্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্রমোৎকর্ষের ধারায় কাজী নজরুলের রোমাণ্টিক-মানসের এ মানব-মুখিতা নিঃসন্দেহেই এক অবিস্মরণীয় সংযোজন।

২

কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাসের সংখ্যা মাত্র তিনটি। উপন্যাস তিনটির নাম যথাক্রমে 'বাঁধনহারা', 'মৃত্যুক্ষুধা' এবং 'কুহেলিকা'। সংখ্যায় অল্প হলেও কাজী নজরুল ইসলামের মানস-পরিচয় এবং বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের যুগান্তর ও যুগ-চেতনার প্রেক্ষিতে উপন্যাসত্রয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ। উপন্যাস তিনটির রচনা-কাল উনিশ শ' একুশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। সমস্ত পৃথিবীতে তখন মহা-যুদ্ধোত্তর ক্রান্তি-যুগ চলছে। মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় তখনো সমস্ত পৃথিবী হাঁপাচ্ছে। দেশে দেশে যুব-সমাজ নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার সংগ্রামে রত। যুদ্ধোত্তর উপমহাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে তখন খিলাফত আন্দোলন, গান্ধিজীর অসহযোগ, স্বদেশী বিপ্লব, সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা, সাম্প্রদায়িক দাঙা চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।[৪] ভারতবাসীকে প্রদত্ত, ইংরেজ তার যুদ্ধ-কালীন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, প্রজা-সাধারণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সে উদাসীন, দেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে চরম অনিশ্চয়তা, যুব-সমাজ অশান্ত। বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। একটা মহা-পরিবর্তনের যুগ সমাসন্ন। মহাযুদ্ধের পূর্বেই ১৯১৩ খৃস্টাব্দে কবিতায় (গীতাঞ্জলি) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে বাংলা সাহিত্যের প্রতি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কেবল কবিতাই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্য, দৃষ্টি ও ভাষা-ভঙ্গির প্রাক-যুদ্ধকালীন সাহিত্যাদর্শের গৌরবে ও মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির সর্বক্ষেত্রেই আধুনিক বাংলা সাহিত্য তার প্রাথমিক পর্বের বিশেষ সমাজ-দৃষ্টি ও ভাষা-ভঙ্গির সার্থক অনুশীলনে প্রাক-যুদ্ধকালেই একটা সুষম পরিণতি লাভ করেছে। বিশেষ করে উচ্চ-বর্ণ শ্রেণীর স্বজাতীয়

জীবন ও সমাজ-সংস্কারমূলক আধুনিক বাংলা উপন্যাস সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের একনিষ্ঠ সাধনায় ইতিপূর্বেই একটা গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যে সমুন্নতি লাভ করেছে। তাদের অনুসরণে মুসলমান ঔপন্যাসিকেরাও স্বসমাজের উচ্চ-বিত্ত, মধ্য-বিত্তের ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কারমূলক জীবন ও সমাজ-আলেখ্য বিরচনে খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না।

উনিশ-শত একুশ থেকে উনিশ-শত ত্রিশ—বাংলা কবিতার মত বাংলা গদ্য তথা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যেরও কালান্তর দশক, বাংলা সাহিত্যের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পালা। এ-ক্ষেত্রেও কাজী নজরুল ইসলাম নায়ক, বাংলা সাহিত্যের নতুন যুগে উত্তরণ দশকের একচ্ছত্র সম্রাট। কল্লোলযুগ-ত্রিশোত্তরের নবীন সাহিত্যিকদের দৃষ্টি তখনো অন্তর্দেশীয় জীবন-সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেনি, নতুন সাহিত্য-সৃষ্টির আগ্রহে তাদের দৃষ্টি তখন ইউরোপীয় সাহিত্যের দিকে নিবদ্ধ।[৫] এ দশকের ১৯২৭, ১৯৩০ এবং পরবর্তী দশকের ১৯৩১ খৃস্টাব্দে যথাক্রমে, কাজী নজরুলের বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা ও কুহেলিকা উপন্যাস তিনটির প্রকাশ-কাল। ঔপন্যাসিক-রূপে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব তখনো ঘটেনি।[৬] তারাশঙ্কর-মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণমুখী উপন্যাস ১৯৩৩-এর পর বিরচিত।[৭]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য শৈল্পিক নির্মাণাদর্শের নিখুঁত সমগ্রতার ঐতিহ্যে ইতিপূর্বেই পাঠক-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেদিক থেকে কাজী নজরুলের উপন্যাস শৈল্পিক নির্মাণাদর্শের নিখুঁতত্ব অবশ্যই দাবী করতে পারেনা। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, সাহিত্যাঙ্গনে গল্পকার হিসেবে নজরুল ইসলামের আত্ম-প্রকাশ সূচিত হলেও তাঁর প্রতিভার গুণ-ধর্ম নিহিত ছিল কাব্য-শিল্পে এবং তার জোরালো সম্ভাবনাময় আভাস তাঁর গল্পের আবেগ-প্রবণ কাব্যিক ভাষাতেই পরিস্ফুট ছিল। অর্থাৎ কথা-শিল্পী হিসেবে আত্ম-প্রকাশ ঘটলেও কাজী নজরুল মূলতঃ এবং প্রধানতঃ ছিলেন কবি। একজন কবিও ভাল ঔপন্যাসিক হতে পারেন। আমাদের বাংলা সাহিত্যেই তার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু একজন প্রকৃত কবির উপন্যাস রচনা মাত্র তিনটি প্রয়াসেই নিখুঁত না-ও হতে পারে। কাজী নজরুলেরও হয়নি। তবে নিখুঁত উপন্যাস রচনার উপযোগী বাস্তব-দৃষ্টি, সংবেদনশীল মানসিকতা, চরিত্র নির্মাণের দক্ষতা ও ভাষা-জ্ঞান নজরুলের

ছিল। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস তার প্রমাণ। তবে দেশ-কালের অগ্নি-দহন, তদ্‌হেতু মানসিক অশান্তি ও নিষ্ঠার অভাব সৎ উপন্যাস রচনায় নজরুলের ব্রত বিঘ্নিত হয়েছে। কাহিনী সংস্থাপনে, অবয়ব সংগঠনে, পূর্ণাঙ্গ চরিত্র নির্মাণে কাজী নজরুলের অবশ্যই কিছু ত্রুটি আছে। কিন্তু তথাপিও বাংলা উপন্যাসের সমাজ-জীবন-দৃষ্টি ও ভাষা-ভঙ্গির সংরক্ষণবাদী চালচিত্র ও স্বভাব-ধর্মের প্রেক্ষিতে, নজরুলের উপন্যাসত্রয়, মুক্ত, উদার ও বস্তুনিষ্ঠ-দৃষ্টিভঙ্গির একাধিক বৈশিষ্ট্যে এবং যুগ-ধর্মের লক্ষণে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের যুগান্তরায়ণের এক অবিস্মরণীয় অবদান-রূপে কীর্তিত হওয়ার যোগ্য। কাজী নজরুল ইসলামই প্রথম ঔপন্যাসিক যিনি শিক্ষিত সংস্কৃতিবান উচচ ও মধ্যবিত্তের আভিজাত্যিক বেষ্টনী থেকে ধর্ম-সম্পর্ক রহিত অসাম্প্রদায়িক মানবত্বে ও স্বাদেশিকতায়, অশিক্ষিত, নিম্নস্তরের খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন চিত্রায়ণে, ভাষার কৌলিন্য-রহিত সর্বজনীনতায়, জীবন-ঘনিষ্ঠ বাস্তবতায় আধুনিক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে মুক্ত করেন। তাই বর্তমান নিবন্ধে নজরুল উপন্যাসের কাহিনী-নির্মাণ, গঠন-শৈলী ও চরিত্র-সৃষ্টির ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ অপেক্ষা তাঁর শিল্পী-আত্মার স্বরূপ দর্শন, জীবন ও সমাজ দৃষ্টির বস্তুনিষ্ঠ মানবিক মূল্য নিরূপণ ও ভাষা-রূপের বস্তুমূল্য নিরীক্ষণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৩

'বাঁধনহারা' কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম উপন্যাস। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হলেও এর পত্রগুলো 'মোসলেম ভারতে' ১৩২৭ সালের (১৯২০) প্রথম মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে বের হতে থাকে।[৮] কবির বয়স তখন বিশ কি একুশ, তরুণ যুবক। কবি হিসেবে স্ফুটনোন্মুখ, মাত্র তিনটি কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি গল্প লিখে ফেলেছেন।[৯] 'বাঁধনহারা'ই প্রথম বড় রচনা। অর্থাৎ উপন্যাস-গল্প রচয়িতা হিসেবেই তাঁর প্রথম দীপ্র আবির্ভাব। 'বাঁধনহারা' বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের প্রথম সুপরিখ্যাত পত্রোপন্যাস।

আত্ম-প্রকাশের দুর্বার ব্যাকুলতায় কাজী নজরুল প্রথম থেকেই উত্তম পুরুষে লেখার প্রতি অধিক যত্নশীল। উত্তম পুরুষে রচনার সুযোগ অনেক,

স্বাধীনতা প্রচুর। ব্যক্তিক অনুভূতির প্রসাদিত অভিব্যক্তির ব্যাপক অবকাশে, বিচিত্র ঘটনা ও প্রসঙ্গের সমাবেশে, ভাষার বুনন কারুকর্মে কাহিনীকে কেন্দ্রীয় আবেগের সঙ্গে অন্বিত করে অতি সহজেই পাঠকের কাছে মনোরম ও আস্বাদনীয় করে তোলা যায় এবং কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও ভাষা-বিন্যাসের সরস ও সাবলীল আন্তরিকতায় রচনার রসাস্বাদনে ব্যত্যয় সৃষ্টি হয়না। কাজী নজরুল সম্ভবতঃ এসব সুবিধা এবং তাঁর অন্তর-প্রকৃতির কথা ভেবেই উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস পত্রোপন্যাস-রূপে পরিকল্পনা করেছেন, সেই সঙ্গে একটা নতুন কৌশলের কৌতূহলও অবশ্যই ছিল। স্মরণীয় পত্রোপন্যাসের কোন আদর্শ নজরুলের সামনে ছিলনা।[১০]

'বাঁধনহারা'র পত্রসংখ্যা আঠারটি। পত্রগুলোর লেখক-লেখিকার সংখ্যা নয় (৯)। তার মধ্যে ছয়জনই নারী। অর্থাৎ 'বাঁধনহারার' পত্র-লেখক পুরুষ চরিত্রের সংখ্যা মাত্র তিন জন। একটি আধ-স্ফুট, ছিন্ন পূর্বরাগের বেদনাকে কেন্দ্র করে ন'জন পাত্র-পাত্রীর পত্রালাপের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। বস্তুতঃ 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে হৃদয় দেয়া-নেয়ার কোন জোরালো কাহিনী নেই। কাহিনীর মূল চরিত্র অর্থাৎ নায়কের আত্মোৎঘাটনই উপন্যাসের আসল উদ্দেশ্য। মা, স্ত্রী, অনূঢ়া বোন এবং দু'চারজন জ্ঞাতি-কুটুম্ব-বেষ্টিত জমিদার রবিয়লের ছাত্র-জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নূরুল হুদা কাহিনীর নায়ক—স্নেহ-প্রীতি ও ভালবাসার আন্তরিকতায় পরিবারের সন্তানের মতই সমাদৃত। প্রতিবেশী আত্মীয়ের কন্যা মাহবুবা রবিয়লের বোন সুফিয়ার একান্ত সুহৃদ এবং রবিয়লদের পরিবারের সকলের সর্বক্ষণের আদৃত কন্যা-স্বরূপ লালিত। এই মাহবুবার সঙ্গে নূরুল হুদার পূর্বরাগ-ঘটিত বিবাহের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বদিন সকলের অজ্ঞাতে নূরুল হুদার যুদ্ধে গমন, বাঁধনহারা উপন্যাসের পটভূমি। এ পরিচ্ছিন্ন বিবাহের পূর্বাপর হৃদয়িক ও প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে পরস্পরের মধ্যে পত্র বিনিময় করেছে রবিয়ল, রবিয়লের স্ত্রী রাবেয়া, মা, বোন সুফিয়া, রবিয়লের শ্যালক ও নূরুল হুদার বন্ধু মনুয়র, মাহবুবা, মাহবুবার মা আয়সা, রাবেয়ার বান্ধবী ব্রাহ্ম-শিক্ষিকা সাহসিকা এবং নায়ক নূরুল হুদা। নূরুল হুদার পত্রসংখ্যা তিনটি। উত্তম পুরুষে রচনার সুযোগে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর পত্রে মূল কাহিনীর সঙ্গে অসম্পর্কিত ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক এবং দৈশিক বিবিধ সমস্যা-প্রসঙ্গকথার উল্লেখ সত্ত্বেও 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে একটা একক, সূক্ষ্ম, কেন্দ্রাতিগ প্রবাহ দুর্লক্ষ্য নয় এবং

স্বাধীনতা প্রচুর। ব্যক্তিক অনুভূতির প্রসাদিত অভিব্যক্তির ব্যাপক অবকাশে, বিচিত্র ঘটনা ও প্রসঙ্গের সমাবেশে, ভাষার বুনন কারুকর্মে কাহিনীকে কেন্দ্রীয় আবেগের সঙ্গে অন্বিত করে অতি সহজেই পাঠকের কাছে মনো-রম ও আস্বাদনীয় করে তোলা যায় এবং কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও ভাষা-বিন্যাসের সরস ও সাবলীল আন্তরিকতায় রচনার রসাস্বাদনে ব্যত্যয় সৃষ্টি হয়না। কাজী নজরুল সম্ভবতঃ এসব সুবিধা এবং তাঁর অন্তর-প্রকৃতির কথা ভেবেই উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস পত্রোপন্যাস-রূপে পরিকল্পনা করেছেন, সেই সঙ্গে একটা নতুন কৌশলের কৌতূহলও অবশ্যই ছিল। স্মরণীয় পত্রোপন্যাসের কোন আদর্শ নজরুলের সামনে ছিলনা।[১০]

'বাঁধনহারা'র পত্রসংখ্যা আঠারটি। পত্রগুলোর লেখক-লেখিকার সংখ্যা নয় (৯)। তার মধ্যে ছয়জনই নারী। অর্থাৎ 'বাঁধনহারার' পত্র-লেখক পুরুষ চরিত্রের সংখ্যা মাত্র তিন জন। একটি আধ-স্ফুট, ছিন্ন পূর্বরাগের বেদনাকে কেন্দ্র করে ন'জন পাত্র-পাত্রীর পত্রালাপের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। বস্তুতঃ 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে হৃদয় দেয়া-নেয়ার কোন জোরালো কাহিনী নেই। কাহিনীর মূল চরিত্র অর্থাৎ নায়কের আত্মোৎঘাটনই উপন্যাসের আসল উদ্দেশ্য। মা, স্ত্রী, অনূঢ়া বোন এবং দু'চারজন জ্ঞাতি-কুটুম্ব-বেষ্টিত জমিদার রবিয়লের ছাত্র-জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নূরুল হুদা কাহিনীর নায়ক—স্নেহ-প্রীতি ও ভালবাসার আন্তরিকতায় পরি-বারের সন্তানের মতই সমাদৃত। প্রতিবেশী আত্মীয়ের কন্যা মাহবুবা রবিয়লের বোন সুফিয়ার একান্ত সুহৃদ এবং রবিয়লদের পরিবারের সকলের সর্বক্ষণের আদৃত কন্যা-স্বরূপ লালিত। এই মাহবুবার সঙ্গে নূরুল হুদার পূর্বরাগ-ঘটিত বিবাহের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বদিন সকলের অজ্ঞাতে নূরুল হুদার যুদ্ধে গমন, বাঁধনহারা উপন্যাসের পটভূমি। এ পরিচ্ছিন্ন বিবাহের পূর্বাপর হৃদয়িক ও প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে পরস্পরের মধ্যে পত্র বিনিময় করেছে রবিয়ল, রবিয়লের স্ত্রী রাবেয়া, মা, বোন সুফিয়া, রবিয়লের শ্যালক ও নূরুল হুদার বন্ধু মনুয়র, মাহবুবা, মাহবুবার মা আয়সা, রাবেয়ার বান্ধবী ব্রাহ্ম-শিক্ষিকা সাহসিকা এবং নায়ক নূরুল হুদা। নূরুল হুদার পত্রসংখ্যা তিনটি। উত্তম পুরুষে রচনার সুযোগে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর পত্রে মূল কাহিনীর সঙ্গে অসম্পর্কিত ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক এবং দৈশিক বিবিধ সমস্যা-প্রসঙ্গকথার উল্লেখ সত্ত্বেও 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসে একটা একক, সূক্ষ্ম, কেন্দ্রাতিগ প্রবাহ দুর্লক্ষ্য নয় এবং

ছিল। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস তার প্রমাণ। তবে দেশ-কালের অগ্নি-দহন, তদ্‌হেতু মানসিক অশান্তি ও নিষ্ঠার অভাব সৎ উপন্যাস রচনায় নজরুলের ব্রত বিঘ্নিত হয়েছে। কাহিনী সংস্থাপনে, অবয়ব সংগঠনে, পূর্ণাঙ্গ চরিত্র নির্মাণে কাজী নজরুলের অবশ্যই কিছু ত্রুটি আছে। কিন্তু তথাপিও বাংলা উপন্যাসের সমাজ-জীবন-দৃষ্টি ও ভাষা-ভঙ্গির সংরক্ষণবাদী চালচিত্র ও স্বভাব-ধর্মের প্রেক্ষিতে, নজরুলের উপন্যাসত্রয়, মুক্ত, উদার ও বস্তুনিষ্ঠ-দৃষ্টিভঙ্গির একাধিক বৈশিষ্ট্যে এবং যুগ-ধর্মের লক্ষণে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের যুগান্তরায়ণের এক অবিস্মরণীয় অবদান-রূপে কীর্তিত হওয়ার যোগ্য। কাজী নজরুল ইসলামই প্রথম ঔপন্যাসিক যিনি শিক্ষিত সংস্কৃতিবান উচচ ও মধ্যবিত্তের আভিজাত্যিক বেষ্টনী থেকে ধর্ম-সম্পর্ক রহিত অসাম্প্রদায়িক মানবত্বে ও স্বাদেশিকতায়, অশিক্ষিত, নিম্নস্তরের খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন চিত্রায়ণে, ভাষার কৌলিন্য-রহিত সর্বজনীনতায়, জীবন-ঘনিষ্ঠ বাস্তবতায় আধুনিক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে মুক্ত করেন। তাই বর্তমান নিবন্ধে নজরুল উপন্যাসের কাহিনী-নির্মাণ, গঠন-শৈলী ও চরিত্র-সৃষ্টির ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ অপেক্ষা তাঁর শিল্পী-আত্মার স্বরূপ দর্শন, জীবন ও সমাজ দৃষ্টির বস্তুনিষ্ঠ মানবিক মূল্য নিরূপণ ও ভাষা-রূপের বস্তুমূল্য নিরীক্ষণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৩

'বাঁধনহারা' কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম উপন্যাস। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হলেও এর পত্রগুলো 'মোসলেম ভারতে' ১৩২৭ সালের (১৯২০) প্রথম মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে বের হতে থাকে।[৮] কবির বয়স তখন বিশ কি একুশ, তরুণ যুবক। কবি হিসেবে স্ফুটনোন্মুখ, মাত্র তিনটি কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি গল্প লিখে ফেলেছেন।[৯] 'বাঁধনহারা'ই প্রথম বড় রচনা। অর্থাৎ উপন্যাস-গল্প রচয়িতা হিসেবেই তাঁর প্রথম দীপ্র আবির্ভাব। 'বাঁধনহারা' বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের প্রথম সুপরিখ্যাত পত্রোপন্যাস।

আত্ম-প্রকাশের দুর্বার ব্যাকুলতায় কাজী নজরুল প্রথম থেকেই উত্তম পুরুষে লেখার প্রতি অধিক যত্নশীল। উত্তম পুরুষে রচনার সুযোগ অনেক,

সে-প্রবাহের কেন্দ্রিত লক্ষ্য নায়ক নূরুল হুদা—নূরুল হুদার আত্ম-স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। ফলে উপন্যাসের অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি।

'বাঁধনহারা' উপন্যাসের নায়ক নূরুল হুদা আসলে নজরুল-মানসেরই চরিত্র-রূপ। উপন্যাসের পত্রগুলো পাঠ করলে এ-ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, বস্তুতঃ নূরুল হুদা নামের আশ্রয়ে স্বয়ং কবি নজরুল একটা অস্ফুট প্রেমের ঘটনাকে অবলম্বন করে তাঁর কবিসত্তার স্বরূপ অন্বেষণ এবং তাঁর অবশ্যম্ভাবী ভাবী আবির্ভাবের মুখবন্ধ-স্বরূপ উপন্যাসটি পরিকল্পনা করেছেন। নূরুল হুদার পত্রে তো অবশ্যই, অন্যান্য পাত্র-পাত্রীর প্রায় সব ক'টি পত্রেই, বিশেষ করে মনুয়র রবিয়ল, সাহসিকা এবং রাবেয়ার পত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নূরুল হুদার বাঁধনহারা স্বভাবের মূলে একটা অসাধারণ মহা-সম্ভাবনাময় বিরল বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে, যেন নজরুল নিজেই বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর পত্রের মাধ্যমে তাঁর অনন্য, অশান্ত ব্যক্তি-সত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন।[১১] স্বল্প-পরিসরের এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে সব ক'টি পত্রের উল্লেখ-উদ্ধৃতি সম্ভব নয়। তবে দু'একটি পত্রের উদ্ধৃতির সাহায্যে বাঁধনহারা উপন্যাসে নজরুলের উল্লিখিত মানসিকতা সম্পর্কে একটা অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপন্যাসের 'বাঁধনহারা' নামের মধ্যে একটা রোমাণ্টিক স্পর্শিতা অবশ্যই স্বীকার্য। জীবন সম্পর্কে 'বাঁধনহারা'র নায়ক নূরুল হুদার ভাবনা-কল্পনা ও দৃষ্টি-ভঙ্গির ভাব-প্রবণতা সম্পর্কেও সবাই একমত এবং উপন্যাসের বাঁধন হারা নামও নূরুল হুদাকে উদ্দেশ্য করেই রাখা হয়েছে। মাহবুবা-নূরুল হুদার পূর্ব-রাগের ঘটনা আসলে নূরুল হুদার রোমাণ্টিক ও মানবিক ভাবাদর্শের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের একটা উপলক্ষ্য মাত্র। উপন্যাসের শেষাংশে নূরুল হুদার বাঁধনহারা স্বভাবের স্বরূপ নির্ধারণের প্রয়াসে রাবেয়াকে লিখিত সাহসিকার সুদীর্ঘ পত্রের বক্তব্য প্রাণিধানযোগ্য—"এ ঘরছাড়া পাগলের দলকে কে যে কোন চির ব্যথার বনে থেকে ঘরছাড়া ডাক ডাকতে তা' আমিও বলতে পারবনা, তুইও পারবিনে, এমন কি ঐ ঘর-ছাড়া পাগল নিজেই বলতে পারবেনা। সে তো আজকের গৃহ-হারা নয়রে রেবা, সে যে চির-উদাসী, চির-বৈরাগী। সৃষ্টির আদিম দিনে এরা সেই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, আর তারা ঘর বাঁধলনা।...এঁরা সদাই কান খাড়া করে আছে,

কোথায় কোন গহন-পারের বাঁশী যেন এরা শুনছে আর শুনছে!···এরা বিশ্বমাতার বড় স্নেহের দুলাল, তাঁর বিকেলের মাঠের বাউল-গায়ক চারণ-কবি রে এরা! এরা সারা বিশ্বকে ভালবাসছে, কিন্তু হায়, তবু ভালবেসে আর তৃপ্ত হচ্ছেনা।···এদের ভালবাসা এত বিপুল, আর এত বিরাট যে, হয়তো তোমরা তাকে উন্মাদের লক্ষণ বলেই ভাবো।···আর অগ্নির কথা? আগুন যদি না থাকবে, তবে এদের চলায় এমন দুর্বার গতি এলো কি করে! এরাই আগুন জ্বালে, এরাই পুড়ে মরে। আগুন তো এদের খেলার জিনিস।···অতএব এসব ছেলেকে বুঝতে হ'লে এদের আদত সত্য কোনখানে সেইটেই সকলের আগে খুঁজে বের করতে হবে।···এই বিদ্রোহীর মনে এমন কোন শক্তি মাথা তুলে প্রদীপ্ত চাওয়া চাইছে যার সঙ্কেতে সে যুগ-যুগান্তরের সমাজ, ধর্ম্ম, শৃংখলা, সব কিছুকে গাধাক্কা দিয়ে নিজের জন্যে আলাদা পথ তৈরী করে নিচ্ছে।"[১২] সাহসিকার উল্লিখিত বক্তব্যের তাৎপর্য থেকে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, নূরুল হুদার এ-বাঁধনহারা স্বভাব একটা খুব-সুলভ বিলাস-মাত্র নয়! বিশ্ব-জগতের গহন-পারের কোন অনির্দেশ্য প্রেমের আহ্বানে এরা চিরদিনের ঘর-ছাড়া পথিক। এ আহ্বান একদিকে প্রেমের অশরীরী বিরহিণীর মর্ম-যাতনার, অপর দিকে অবদমিত বিশ্ব-মানবতার, উপেক্ষিত মানবাত্মার। কোন সে মহা-সত্যের অনিবার্য প্রেমের, কল্যাণের অগ্নি-জ্বালা আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানবলোকে অকল্যাণ-অসুন্দর-অসত্যের বিরুদ্ধে, অন্যায় অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে, মানবতার প্রেমে সত্য-সুন্দর-কল্যাণকে জাগ্রত করার জন্যই যুগে যুগে এদের মর্ত্যলোকে আগমন। তাই এরা চির-বাঁধনহারা; তাই এরা বিদ্রোহী। একদিকে অচিন-লোকের কোন মহা-সুন্দরের অনির্দেশ্য বিমূর্ত প্রেম-বেদনার আহ্বান, আর একদিকে বিশ্বক্ষেত্রে বিশ্ব মানুষের জন্য সীমাহীন ভালবাসার আহবানে এরা চিরকালই দুর্গম রহস্য-লোকের যাত্রী। তাই বিষয়-আশয়-ভোগী সংসারী মানুষের পক্ষে এদের বাঁধনহারা জীবনের মর্ম-যাতনা বুঝা বড় কঠিন। মাহবুবার বিচ্ছিন্ন পূর্ব-রাগের বেদনায় পীড়িত নূরুল হুদা নিজেই তার বাঁধনহারা রোমাণ্টিক প্রেম-যাতনার স্বরূপ অন্বেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। মনুয়রকে লিখিত এক পত্রে তাঁর সে-মানসিকতার পরিচয় বিধৃত—"তাই বাউল গানের অলস সুরে সামনের উদাসীন পথে আমার ক্রন্দন-আনন্দ একটা একটানা বেদনা সৃজন করে চলেছে, দিগন্তের সীমা ছাড়িয়ে অনন্তের পানে প্রসারিত হয়ে

গেছে সে-পথ। বুকের ভিতর ক্রন্দন জাগে তার সেই চিরন্তন প্রশ্ন নিয়ে--‘এ পথ গেছে কোনখানে গো কোনখানে।’ এই অশেষের শেষ পেতে ততই প্রাণ আকুলি-বিকুলি করে উঠে। তাতেও কত আনন্দ। এই যে নিরুদ্দেশ যাত্রা আর পথহীন পথচলার গূঢ় আনন্দ, তা’ থেকে আমার অতৃপ্ত আত্ম-তৃপ্তিকে বঞ্চিত করব কেন?···এই অসীমের সীমা খোঁজায়, নিরুদ্দেশের চেষ্টায় যে দীর্ঘ অতৃপ্তির আশা-আনন্দ, সেই ত আমার উগ্র আকাঙক্ষার রোখ চড়িয়ে দিচে। শেষ হলে যে এ পথ চলারও শেষ আর আমার আনন্দেরও শেষ, তাই আমি পথ চলি আর বলি, যেন এ পথের আর শেষ না হয়।··· কোথায় সে পথের বঁধূ যার বাঁশী নিরন্তর বিশ্ব মানবের মনের বনে এমন ঘর-ছাড়া ডাক ডাকচে? যার অশরীরী ছোঁয়া শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সারাক্ষণই অনুভব করচি! এর সন্ধান কে দেবে।”[১৩] এ যে রোমাণ্টিক কবি নজরুলেরই অন্তর্বেদনা! মানুষের প্রেম তৃষা অন্তহীন। মানবীর সীমিত প্রেমে তার খণ্ডিত আস্বাদ মাত্র আছে, পরিতৃপ্তি নেই; গ্লানি আছে, প্রাপ্তির পূর্ণতা নেই। তার চেয়ে অনন্ত প্রেম-তৃষার প্রজ্বলিত আকাঙক্ষার হোম-শিখা নিয়ে দুশ্চর প্রতীক্ষার যাতনা অনুভব অনেক মধুর। মাহবুবার বিচ্যুত পূর্ব-রাগের বেদনা নূরুল হুদাকে বিশ্বময় সেই অশরীরী প্রেমের অন্তহীন বিরহের বেদনা-মধুর ‘ক্রন্দন-আনন্দের’ পথে নিরুদ্দেশ-লোকের অভিসারী করে তুলেছে। আকাঙক্ষার আগুন বুকে নিয়ে এ-পথ চলাই তার আনন্দ। এ-অতৃপ্ত প্রেম-বেদনার রোমাণ্টিক অভিসারই নূরুল হুদা তথা কবি নজরুলের প্রেম-তীর্থ, তাঁর রোমাণ্টিক প্রেম-কবিতার বিমূর্ত যাতনা-লোক। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রোমাণ্টিক কাব্য জগতে অতৃপ্ত প্রেমের এ আর এক অভিনব বেদনার স্বর্গলোক। তবে তা একেবারে মানব-সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন নয় এবং একটা মানবিক সম্পর্ক আছে বলেই এ-অতৃপ্তির বেদনা-অনুভব এত মর্মস্পর্শী।[১৪] নজরুলের কবিতার এ-বিমূর্ত প্রেম-বেদনার শৈল্পিক আস্বাদন বাংলা কবিতার জগতে আর এক বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেছে।

‘বাঁধনহারা’র নূরুল হুদার রোমাণ্টিক ভাবাদর্শের আর একটি বৈশিষ্ট্য, আর একটি যাতনা আছে। সে-বৈশিষ্ট্যের, সে-যাতনার আভাস ইতিপূর্বে সাহসিকার পত্রের উদ্ধৃতিতে লক্ষিত হয়েছে। সে-বৈশিষ্ট্য তাঁর মানবতা এবং মানবাত্মার মুক্তি-বেদনার চেতনায় প্রতিভাসিত। রাবেয়াকে লেখা নূরুল হুদার পত্রেও তার অনুরূপ মানসের আরো স্পষ্ট বেদনাভাস অনুধাবনীয়—

"আমি চাচ্ছিলাম আগুন—শুধু আগুন—সারা বিশ্বের আকাশে বাতাসে, বাইরে-ভিতরে আগুন, আর তার মাঝে আমি দাঁড়াই আমারও বিশ্বগ্রাসী অন্তরের আগুন নিয়ে, আর দেখি কোন্ আগুন কোন্ আগুনকে গ্রাস করে নিতে পারে। ...সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এখানে যে, এ মানুষেরই এতটুকু দুঃখ দেখে সময় সময় আমার সারা বুক সাহারার মত হা-হা করে আর্তনাদ করে উঠে। হৃদয়ের এই যে দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত দুষমনী-ভাব, এর সূত্র কোথায়, হায়, কেউ জানে না। আমার নিষ্ঠুর পাশবিক দুষমনী মানুষের উপর নয়, মানুষের স্রষ্টার উপর। এই স্বষ্টিকর্তা যিনিই হন, তাকে আমি কখনই ক্ষমা করতে পারবনা। আমাকে লক্ষ-জীবন জাহান্নামে পুড়িয়ে আমায় কবজায় আনবার শক্তি ঐ অনন্ত অসীম শক্তি-ধারীর নেই।...সে কোন অনন্ত যুগের অফুরন্ত কান্না কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনিয়ে উঠুক বিষের মত—তীব্র হলাহলের মত।"[১৫] বিমূর্ত প্রেম-বেদনায় যে নূরুল হুদা অনন্ত পথের যাত্রী, যে প্রেমের বিরহ-যাতনা নূরুল হুদার আজীবন পথ-চলার ক্রন্দন-আনন্দ,—এ আবার কোন বেদনার অগ্নিজ্বালার এমন ভয়ঙ্কর রুদ্র রূপ যা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত সমস্ত স্বষ্টিকে পুড়িয়ে দিতে চাইছে—লক্ষ জীবন জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়েও যে নূরুল হুদাকে কবজায় আনার শক্তি বিধাতার নেই! প্রেম পথের যাত্রী নুরুল হুদার এ-ক্ষোভ এ-আক্রোশ, তীব্র হলাহলের মত এ-জ্বালা কিসের! বিশ্ব-মানবাত্মার বিশ্বক্ষেত্রে মানবাত্মার ক্রন্দনে, মানবত্বের অবমাননায় এই ভয়ঙ্কর রুদ্র রূপ তারই যিনি কোন অচিন গহনপার থেকে 'বিশ্বমানব মনের বনে' ঘর ছাড়া প্রেমের বাঁশী বাজান। এ আক্রোশ, এ অগ্নিজ্বালা, এ রুদ্র-রোষ অবমানিত, নিষ্পিষ্ট মানবাত্মার, উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত মানবতার। যে অশেষ প্রেমের বাঁশী 'বিশ্ব-মানব মনের বনে' অন্তরের ভিতরে-বাইরে এমন বিপুল অন্তহীন বেদনার অনির্বাণ শিখা জ্বালিয়ে রেখেছে, বিশ্ব-মানবাত্মার বিশ্ব-ক্ষেত্রে সেই প্রেমের এমন অসহায় করুণ আর্তনাদ, সেই প্রেম-সুন্দর মানবাত্মার এমন নিদারুণ অবজ্ঞা অচিন প্রেম-পথের যাত্রী নূরুল হুদার সইবে কেন! মানবাত্মার প্রতি এই সীমহীন অবহেলা, মানব-অবমাননাই নূরুল হুদার নিরুদ্দেশ প্রেমের 'ক্রন্দন-আনন্দ'কে করে তুলেছে বিশ্বগ্রাসী মহা-বুভুক্ষু অশিব-বিনাশী স্রষ্টা-দ্রোহী। এ-প্রসঙ্গে 'বাঁধনহারা' উপন্যাসের শেষ পত্রের উপসংহারে নূরুল হুদার উক্তি কবি নজরুলের কবি-আত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ— "আমার বাঁধনহারা

জীবন নাট্যের একটা অঙ্ক অভিনীত হয়ে গেল। এরপর কি আছে, তা' আমার জীবনের পাগলা নটরাজই জানেন।''[১৬] নজরুলের কবি-জীবনে এই 'পাগলা নটরাজ' কি করেছেন, তা' নজরুলের ভক্ত পাঠক-মাত্রই অবহিত।

বস্তুতঃ 'বাঁধনহারা' কাজী নজরুলের আত্ম-সমীক্ষণ-মূলক পত্রোপন্যাস। বাঁধনহারা উপন্যাসে নূরুল হুদার নামান্তরে কাজী নজরুল বিমূর্ত প্রেম-বেদনার একান্ত আত্মিক যাতনা এবং বিশ্বব্যাপী উপদ্রুত নিষ্পিষ্ট মানবাত্মার করুণ আর্তনাদে তাঁর রোমাণ্টিক কবি-আত্মার প্রেমাত্মক ও মানবত্বের বিদ্রোহাত্মক দ্বৈত-সত্তার অবরোধ অন্বেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। 'বাঁধনহারা' কাজী নজরুলের কবি-আত্মার যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি'র মতই একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-পত্ররূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। এ-বাঁধনহারায় কাজী নজরুলের মানবতার বেদনার জীবন-ঘনিষ্ঠ বাস্তব প্রয়াসেরই সৃষ্টি 'মৃত্যুক্ষুধা' ও 'কুহেলিকা' উপন্যাস দু'টি।

৪

'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০) এবং 'কুহেলিকা' (১৯৩১) নজরুল ইসলামের যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপন্যাস। মৃত্যুক্ষুধা ও কুহেলিকা তাঁর বাঁধনহারার মত উত্তম-পুরুষে লেখা আত্ম-সমীক্ষণ-মূলক কাব্য-ধর্মী পত্রোপন্যাস নয়। বাঁধনহারার সঙ্গে রচনা-কালের ব্যবধানও যথাক্রমে দশ ও এগার বৎসর। যেমন কাব্য-সৃষ্টির প্রাচুর্যে, তেমন নজরুলের ব্যক্তি-জীবনে এই দশ বৎসর ঘটনাবহুল। বাংলা কাব্যের প্রতিষ্ঠিত স্নিগ্ধ, কোমল, বিনম্র আবহে অভিনব মিঠে-কড়া ভাবাস্বাদনের বৈচিত্র্যে এবং বাণীভঙ্গির মন্দ্রিত ধ্বনি-তরঙ্গের চমৎকারিত্বে এক স্বতন্ত্র কাব্যালোকের দ্রষ্টা ও স্রষ্টারূপে কাজী নজরুল ইতিমধ্যেই সপ্রশংসায় সমারূঢ়। ঘটনাবলীর দিক থেকে কাজী নজরুল এ-সময়ে বিদ্রোহাত্মক কবিতা রচনার জন্য এক বৎসর তিন মাস বৃটিশ সরকারের কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন (১৯২২-২৩),[১৭] এবং কারাবাস-অন্তে বিবাহ করে (১৯২৪) সস্ত্রিক হুগলীতে বসবাস করতে থাকেন। হুগলীতে অবস্থান কালে কবি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন (১৯২৫) এবং কংগ্রেসের বাম-ঘেঁসা সহকর্মী হেমন্তকুমার সরকারের সঙ্গে জেলে-চাষীদের সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন।[১৮] এ-সময়েই তিনি ক্রমশঃ সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং কংগ্রেসের অঙ্গ-সংগঠন শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ দল গঠন করেন (১৯২৫)। এই শ্রমিক-প্রজা

স্বরাজ দলের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'লাঙ্গলের' প্রধান পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।[১৯] কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক চরিত্রের জন্য শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ দল কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল' গঠন করে। নজরুল এ-দলের কার্য-নির্বাহক কমিটির সদস্য ছিলেন।[২০] ষোলটি সংখ্যা বের হওয়ার পর 'লাঙ্গল' নাম পরিবর্তন করে 'গণবাণী' নামে 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের' সাপ্তাহিক মুখপত্র রূপে মুজফ্ফর আহমদের সম্পাদনায় প্রকাশ হতে থাকে (১৯২৭)।[২১] গণবাণীর সঙ্গে কাজী নজরুল ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন।[২২] শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ দলের সঙ্গে জড়িত থাকাকালেই রাজনৈতিক প্রয়োজনে হেমন্তকুমার সরকার ১৯২৬ খৃস্টাব্দের জানুয়ারীতে সপরিবারে কাজী নজরুল ইসলামকে কৃষ্ণ-নগরে নিয়ে আসেন। এই কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়ক নামক মুসলিম-খৃস্টান অধ্যুষিত এলাকায় কাজী নজরুল সপরিবারে প্রায় চার বৎসর (১৯২৬-২৯) অবস্থান করেন।[২৩] এই সময়ে তাঁর জীবনের রাজনৈতিক ঘটনাবলী, 'লাঙ্গল' ও 'গণবাণী' পত্রিকার সংশ্লিষ্ট মতাদর্শ এবং জীবন ও সমাজ-অভিজ্ঞতার পটভূমিতে রচিত হয় 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস।

কাজী নজরুলের উপন্যাসত্রয়ের মধ্যে 'মৃত্যুক্ষুধার' শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। তাঁর উপন্যাসত্রয়ের কাহিনী-নির্মাণ, অবয়ব-সংগঠন, চরিত্র-সৃষ্টি ইত্যাদির তুলনামূলক বিশ্লেষণে 'মৃত্যুক্ষুধা' অবশ্যই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপ-ন্যাস। তবু বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত ও গৌরবিত ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে এবং আঙ্গিকগত গঠন-শৈলীর নিরিখে নজরুল একজন সফল উপন্যাস-শিল্পী নন। কিন্তু কাজী নজরুলের উপন্যাসে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা' বাংলা উপন্যাস-শিল্পে ইতিপূর্বে লক্ষিত হয়নি। নজরুলের উপন্যাস পাঠে মনে হয়, উপন্যাসের আঙ্গিকগত সৌষ্ঠব তাঁর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলনা। মানুষের জন্য, মানবতার জন্য, অসাম্প্রদায়িক, মুক্ত দেশপ্রেমের জন্য বাংলা উপন্যাস-শিল্পের হৃদয় উন্মুক্ত করাই ছিল তাঁর উপন্যাস রচনার অভিনিবিষ্ট লক্ষ্য। 'মৃত্যুক্ষুধা' ও 'কুহেলিকা' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সে-গৌরবের অধিকারী। কাজী নজরুলের উপন্যাসের আঙ্গিকগত সৌষ্ঠবের চাইতে তাঁর জীবন-দৃষ্টি অধিক গুরুত্ব-পূর্ণ। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে কাজী নজরুল "লাঙ্গল" পত্রিকার প্রধান পরিচালক ছিলেন। এ-পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যার শিরোদেশে চণ্ডীদাসের

'শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এই অমর বাণীটি মুদ্রিত থাকত।[২৪] নজরুল ইসলাম তাঁর সমস্ত জীবন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে মানুষের এই পরম চিরন্তন মহা-সত্যকে উদ্ভাসনের সাধনা করে গেছেন। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে কাজী নজরুল এই 'মানুষ সত্যে'র দৃষ্টিতে দেশ, জাতি, সমাজ, জীবন ও মানুষকে দেখার ও বিচার করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই দৃষ্টি-ভঙ্গিই ছিল ঔপন্যাসিক নজরুলের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

'মৃত্যুক্ষুধা'র আখ্যানভাগ সুসংবদ্ধ বিন্যাসের অভাবে দুটি বিচ্ছিন্ন কাহিনী-রূপে উপস্থাপিত হয়েছে, একটি মাত্র চরিত্র তার যোগ-সূত্র। সে চরিত্রটি হলো উপন্যাসের মেজবৌ। সমাজের উচচ-নীচ উভয় শ্রেণীর আবাসস্থল কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাঁদ-সড়ক এলাকা। এই চাঁদ-সড়কের একটি পাড়ায় গা ঘেঁসাঘেঁসী করে বাস করে খেটে-খাওয়া দিন-মজুর শ্রেণীর দেশী খৃস্টান ও মুসলমান। খানসামা, রাজমিস্ত্রী, বাবুর্চিগিরি কিম্বা ঐ রকম কিছু একটা করে ওদের কোন রকমে খেয়ে-না-খেয়ে দিন চলে। মেয়েরা ধান ভানে, জল টানে, সংসারের কাজ-কর্ম করে, 'রাঁধে, কাঁদে এবং নানান দুঃখ-ধান্দা করে পুরুষদের দুঃখ লাঘব করবার চেষ্টা করে।' এ-পাড়ারই মুসলমান বিধবা গজালের মা। তার বিধবা তিন পুত্র বধূ, তাদের প্রায় ডজন খানেক বাচচা-কাচচা, স্বামী পরিত্যক্ত গর্ভবতী মেয়ে পাঁচি এবং আঠার-উনিশ বছরের একমাত্র উপার্জন-ক্ষম পুত্র প্যাঁকালেকে নিয়ে মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের প্রথমার্ধের কাহিনী গড়ে উঠেছে। গজালের মা'র বিধবা মেজ-পুত্র-বধূই উপন্যাসের মেজবৌ। নিম্নশ্রেণীর খেটে খাওয়া অশিক্ষিত, অভাবী, নিরন্ন, এ পরিবারের প্রধান তিনটি চরিত্র মেজবৌ, প্যাঁকালে ও গজালের মা—ন্যূনতম আশা-আকাঙক্ষা নিয়ে জীবনকে আকড়ে ধরে কোন রকমে বেঁচে থাকার প্রাণপণ প্রয়াস সত্ত্বেও সর্বগ্রাসী ক্ষুধার তাড়নায় তাদের দুঃখের সোনার সংসার কি ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গেল, 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের প্রথমার্ধে তারই সকরুণ বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। 'মৃত্যুক্ষুধা'র দ্বিতীয়ার্ধে এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধার অগ্নিজ্বালা থেকে নিরন্ন, নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের মুক্তির কঠিনতম সংগ্রামের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এ-সংগ্রাম অবজ্ঞাত, বঞ্চিত খেটে-খাওয়া অগণিত দিন-মজুর মানুষের বেঁচে থাকার সমান অধিকার

আদায়ের সংগ্রাম, সাম্যবাদের সংগ্রাম। নায়ক ধনীর দুলাল, সাম্যবাদের একনিষ্ঠ কর্মী আনসার, খেটে-খাওয়া কুলি-মজুর শ্রেণীর কাছে সাম্যবাদী সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্তির ডাক পৌঁছে দেয়ার জন্য কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়কে এক জ্ঞাতি বোনের বাসায় এসে উঠেছে। পিতা-মাতার স্নেহের বন্ধন অস্বীকার করে, প্রণয়িনীর প্রেম উপেক্ষা করে, ধন-সম্পদের মোহ ত্যাগ করে নিরন্ন, অবজ্ঞাত মানবতার বৃহত্তর ডাকে কুলি-মজুরের মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত-প্রাণ আনসার কি ভাবে বৃটিশ সরকারের জেলজুলুমে তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, মৃত্যুক্ষুধার শেষার্ধে তারই কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের এ-দু'টো কাহিনীর যোগ-সূত্র আপাতঃদৃষ্টিতে ক্ষীণ মনে হলেও প্রেরণা ও আদর্শের বিচারে অভিন্ন। উপন্যাসের প্রথমার্ধের কাহিনীতে সমাজের অতি নিম্ন-শ্রেণীর 'একই প্রভুর পোষা বেড়াল আর কুকুরে'র মত নিরন্ন, নিগৃহীত মানুষের মানবেতর জীবন-যাপনের অতি বাস্তব চিত্রের মাধ্যমে সমাজ ও ধর্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস আছে। উপন্যাসের এ-অংশে গজালের মা'র অভাব-অনটন, দুঃখ-দৈন্যের সংসারে মমতাময়ী, প্রাণ-উচ্ছল মেজবৌ এবং স্নেহশীল, সৌখিন, প্রেমিক প্যাঁকালের চরিত্রের মধ্য দিয়ে কাজী নজরুল সমাজ ও ধর্মের চেয়ে মানুষ অনেক বড়, অনেক মহৎ; মানুষের বাঁচার অধিকার, জীবনের দাবী সমাজ ও ধর্মের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ—এ-পরম সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যে সমাজ ও ধর্ম মানুষের বাঁচার অধিকারকে অবহেলা করে, যে সমাজ ও ধর্ম মানুষের আত্মার অবমাননায় উদাসীন, মৌলিক অধিকার রক্ষায় বিমুখ, মানবতার লাঞ্ছনায় নির্বিকার, মানুষের কাছে সে-সমাজ ও ধর্মের কোন মূল্য নেই, সে-সমাজ ও ধর্মের প্রতি মানুষের কোন শ্রদ্ধা-বোধ থাকেনা। মেজবৌ এবং প্যাঁকালেরও ছিলনা। তাই মেজবৌ ও প্যাঁকালে দু'বেলা দুটো ভাল-মন্দ খেয়ে জীবনে মানুষের মত বেঁচে থাকার অনিবার্য আহ্বানে সমাজ ও ধর্মকে অনায়াসে ত্যাগ করে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। কিন্তু আমাদের সমাজের দাপট, ধর্মের গোঁড়ামি এতই প্রবল যে একদিন পুত্রের মৃত্যুর সংবাদে জীবনের গভীর মায়াময় নিরুপায় মেজবৌকে প্রায়শ্চিত্ত করে সেই সমাজের পদতলেই আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়েছে। কিন্তু ততদিনে গজালের মার দুঃখের সোনার সংসার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

সমাজ ও ধর্মের এই অবহেলা-অবজ্ঞা-উদাসীনতা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য-বৈসাম্যের শিকার উপেক্ষিত মানবতার বেদনাই মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের প্রায় বিচ্ছিন্ন দুটি কাহিনীর অন্তর্নিহিত কৈন্দ্রিক যোগ-সূত্র। এই যোগ-সূত্রের একপ্রান্তে সমাজ ও ধর্মের অবজ্ঞা-অবহেলা ও দুঃখ-দারিদ্র্যের তাড়নায় গজালের মা, মেজ-বউ ও প্যাঁকালের বেঁচে থাকার কৃচ্ছ্রসাধনার অতি নিখুঁত বাস্তব চিত্র; আর এক প্রান্তে সমাজ, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে এ উপেক্ষিত লাঞ্ছিত মানবতার বৃহত্তর মুক্তি-সংগ্রামে আনসারের সাম্যবাদের আহ্বান, একপ্রান্তে অভিশপ্ত জীবনের বাস্তব উপস্থাপনা, অপর প্রান্তে এ-অভিশাপ থেকে বাঁচার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতি। এ দু'প্রান্তের যোগ-সূত্র মুক্তি-কামী মেজবৌ—তার খৃস্টান ধর্মগ্রহণ এ যোগ-সূত্রের সন্ধিস্থল। মিশনারীদের গির্জায় আনসারের প্রশ্নোত্তরে মেজবৌ-এর—'জি-না। আপনারা একটু একটু করে আমায় খৃস্টান করেছেন'—যোগসূত্রের সন্ধিমুখ। উত্তরের তীক্ষ্ণ-তায় চমকিত আনসার বুঝতে পারল কত যুগ-যুগান্তরের অবজ্ঞা-অবহেলার বেদনা অভিযোগ জমাট বেঁধে আছে এই ঈষৎ বক্রোক্তির মধ্যে! আনসারে সংগ্রামের বেদনা যে এই যুগ-যুগান্তরের উপেক্ষার ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত। অবহেলা-অবমাননার এবং তা থেকে মুক্তির সংগ্রামের বেদনার সম্পর্কের মধ্যেই মৃত্যুক্ষুধার দ্বি-খণ্ডিত কাহিনীর গ্রন্থি স্থাপিত।

কাজী নজরুল ইসলামের সূক্ষ্ম ও বাস্তব জীবন-দৃষ্টি, অবহেলিত মানুষের জন্য মমত্ববোধ যে কত গভীর ছিল মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের প্রথমার্ধে তার পরিচয় পরিস্ফুট। এ-অংশের ছোট-বড়, তুচ্ছ প্রতিটি চরিত্র নজরুল গভীর সহানুভূতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। শোকে-তাপে দগ্ধ, দুঃখ-দৈন্যে পীড়িত, তবু আশা-নৈরাশ্যে, ধৈর্যে-স্থৈর্যে, স্নেহে-মমতায় অতি দুঃখের সোনার সংসারটিকে আগলে রাখার প্রাণপণ প্রয়াসে ব্যাকুল, চিন্তাগ্রস্থ গজালের মা; রূপে-গুণে-বুদ্ধিতে প্রগলভ, সেবা-যত্ন, মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসায় বিনম্র, প্রাণের উচ্ছলতায় উন্মুখ, নিত্য অভাব-গ্রস্থ নিরন্ন গজালের মা'র দুঃখের সংসারে বেদনার আনন্দ-মূর্তি—দু' সন্তানের জননী বিধবা মেজবৌ; কুর্শির প্রেমে পুলকিত, বাবুদের সুখের থিয়েটারে নেচে-গেয়ে সখী সেজে গর্বিত, মায়ের স্নেহে অবাধ্য, সংসারের প্রতি দায়িত্ব-বান, স্নেহশীল, কর্তব্য-নিষ্ঠ রাজ-মিস্ত্রী আঠার উনিশ বৎসরের নবীন যুবক প্যাঁকালে; স্বল্পভাষী শান্তি-প্রিয় বড় বৌ; মৃত্যু-পথযাত্রী ছোট বৌ;

প্যাঁকালের প্রেমে আকুলিত কুর্শি ; রোতে কান্নার এমন কি অতি তুচ্ছ প্রতিটি শিশু চরিত্রের প্রতি অতি সূক্ষ্ম, বস্তুনিষ্ঠ, সংবেদশীল মনোযোগে এবং বিনা চিকিৎসায় ছোট বৌ-এর অসহায় মৃত্যু, মেজবৌ ও প্যাঁকালের খৃস্টান ধর্ম গ্রহণের পর গজালের মা'র অক্ষম আক্রোশ ও সামাজিক-ধর্মীয় প্রায়শ্চিত্ত, মেজবৌ ও প্যাঁকালের বেদনাদায়ক প্রত্যাবর্তন, গজালের মা'র করুণ মৃত্যু ইত্যাদি প্রতিটি ছোট, বড়, তুচ্ছ ঘটনা-দৃশ্যের অতি নিখুঁত জীবন-ঘনিষ্ঠ বর্ণনায় নজরুল যে বিস্ময়কর সংযম, নিষ্ঠা, পরিমিতি-জ্ঞান বাস্তবচেতনা ও মমত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন তা একজন প্রখর দৃষ্টিক্ষম, মানবতাবাদী দক্ষ ঔপন্যাসিকের পক্ষেই সম্ভব।

এসব নিরন্ন, খেটে-খাওয়া অসহায় দরিদ্র, দিন-মজুর শ্রেণীর মানুষের করুণ, বেদনাদায়ক পরিণতির জন্য কাজী নজরুল পরোক্ষভাবে সমাজ ও ধর্মের অবহেলা-অবজ্ঞা, অন্যায়-অত্যাচারকে দায়ী করে তাঁর 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধের নায়ক আনসারের খিলাফত ত্যাগ করে সাম্যবাদী আন্দোলনে যোগদান করার পক্ষে অতি সূক্ষ্মভাবে যুক্তি উপস্থিত করার প্রয়াস গ্রহণ করেছেন বলে ধারণা হয়। কারণ, মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাস রচনার সময় নজরুল সাম্যবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুক্ষুধার শেষার্ধের নায়ক আনসার কাজী নজরুলের নিগৃহীত মানবত্বের মুক্তির সংগ্রামে সাম্যবাদী চেতনার মানস-চরিত্র ; অবহেলিত মানবাত্মার আহ্বানের চির-বাঁধনহারা, ঘরছাড়া। মায়ের স্নেহ, নারীর প্রেম, সম্পদের মোহ, জীবনে মায়া সব তুচ্ছ করে মানবতার মুক্তির মহান ব্রতে আমৃত্যু উৎসর্গিত প্রাণ আনসার,—উপেক্ষিত, অবলুণ্ঠিত মানবাত্মার আহ্বানে মৃত্যু-পথের যাত্রী এবং আনসারের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

৫

কাজী নজরুল ইসলামের অশান্ত রোমাণ্টিক কাব্য-চেতনার মানব-মুখিতার কথা ইতিপূর্বে 'বাঁধনহারা' উপন্যাসের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং মানবতার বেদনার সংরাগে অনুবদ্ধ তাঁর উপন্যাস-চিন্তার প্রতি-ফলিত রূপও মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের আলোচনায় পরিদৃষ্ট হয়েছে। মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে লক্ষিত হয়েছে, তাঁর উপন্যাস-চিন্তার জীবন ও সমাজ-দৃষ্টি তখনই অতি সূক্ষ্ম বাস্তবতায় হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে, যখন বঞ্চিত, অবহেলিত

মানুষের জীবন-ঘনিষ্ঠ বেদনার বস্তুনিষ্ঠ চিত্ররূপে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু ঐ একটি মাত্র দৃষ্টান্ত ব্যতীত তাঁর আদর্শায়িত মানবিক বেদনার উপন্যাস-রূপ সর্বত্রই কম-বেশী রোমাণ্টিকতায় পরিমণ্ডিত হয়ে তাঁর বাস্তব-দৃষ্টিকে খর্ব করেছে। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'কুহেলিকা'ও মানবিক ঐক্যে মুক্ত স্বদেশ-প্রিয়তার উক্তরূপ একটি রোমাণ্টিক উপন্যাস।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, 'মৃত্যুক্ষুধা' ও 'কুহেলিকা' উপন্যাস দুটি অসহযোগ, খিলাফত, বিপ্লব, সন্ত্রাস, স্বাদেশিক ইত্যাদি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচণ্ডতম বিক্ষোভের পটভূমিতে রচিত। এই সমস্ত আন্দোলনেরই একটা নিজস্ব সাম্প্রদায়িক চরিত্র ছিল। বৃহত্তর মানবতার ঐক্যে মুক্ত, অসাম্প্রদায়িক স্বদেশ-প্রিয়তায় বিশ্বাসী, মানবতাবাদী কাজী নজরুল, সঙ্গত কারণেই এই সব আন্দোলনের প্রতি খুব আস্থাবান ছিলেননা। বিদ্রোহ ভাবোদ্দীপক নজরুল ব্যক্তিগত-ভাবে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী হলেও, এ-সময়ের প্রবল সাম্প্রদায়িক-মনস্ক বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি তাঁর কোন সমর্থন ছিলনা। অধিকন্তু মানবতাবাদী নজরুল ক্রমশঃ সাম্যবাদের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠছিলেন, ইতিপূর্বে তা' উল্লেখ করা হয়েছে এবং মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের নায়ক আনসারের চরিত্র পরিকল্পনায় তার পরিচয় সক্ষিপ্ত হয়েছে। উল্লিখিত বিসদৃশ রাজনৈতিক পটভূমিতেই তাঁর 'কুহেলিকা' উপন্যাস রচিত।

বলাবাহুল্য, বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে কাজী নজরুলের 'কুহেলিকা' সন্ত্রাসী বিপ্লবের উপর লিখিত দ্বিতীয় উপন্যাস হিসেবে পরিগণিত। প্রথম উপন্যাস শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী (১৯২৬)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) বিপ্লব নিয়ে রচিত তৃতীয় উপন্যাস।[২৫] স্বাধীনতার বিপ্লবী আন্দোলনে মুসলমানদের সংযোজন, অসাম্প্রদায়িক মুক্ত স্বদেশ-প্রিয়তা এবং বিপ্লবী মন্ত্রের সঙ্গে নারী-প্রেমের দ্বন্দ্ব, এ তিনটি মৌলিক বিষয়কে কেন্দ্র করে কুহেলিকা উপন্যাসের কাহিনী-ভাগ গড়ে উঠেছে। উল্‌ঝুলুল ওরফে জাহাঙ্গীর, প্রমত্ত, হারুন, তহমিনা ওরফে ভূণী, জয়তী, চম্পা, অনিমেষ এবং নেপথ্য-চরিত্র বজ্রপাণি কুহেলিকা উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র। কুমিল্লার এক জমিদারের অবৈধ পুত্র জাহাঙ্গীর (বন্ধুদের দেয়া নাম উল্‌ঝুলুল) কুহেলিকা উপন্যাসের নায়ক। স্কুল জীবনে কিশোর বয়সেই বিপ্লবী শিক্ষক প্রমত্তদার কাছে জাহাঙ্গীর বিপ্লবীদের অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে। বিপ্লবী মন্ত্রে কোন মুসলমানকে

দীক্ষা দেয়া নিষিদ্ধ, জনৈক ছাত্রের এরূপ প্রশ্নের উত্তরে, মুসলমানদেরকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দেয়ার পক্ষে প্রমত্তর সুদীর্ঘ বক্তৃতার যুক্তি-যুক্ততায় এবং বক্তৃতার শেষাংশে অসাম্প্রদায়িক, মুক্ত দেশ-প্রেমে উদ্দীপ্ত ও মানবতায় অনুপ্রাণিত প্রমত্তর প্রদীপ্ত উচচারণ—"আমার ভারত এ মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয়রে, অনিম।...আমার ভারতবর্ষ—ভারতের এই মূক দরিদ্র, নিরন্ন, পরপদ-দলিত তেত্রিশ কোটী মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইণ্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, গাছ-পালার ভারতবর্ষ নয়—আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন তীর্থ। ...ওরে, এ ভারত-বর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মস্‌জিদের ভারতবর্ষ নয়,- এ আমার মানুষের মহাভারত।"—এর মধ্য দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের সার্থকতা সম্পর্কে নজরুলের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রাথমিক উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে এবং বিপ্লবের সন্ত্রাসী কর্ম-কাণ্ডের সঙ্গে মুসলমান জাহাঙ্গীরের সংযুক্তির মধ্য দিয়ে কাহিনীতে নজরুলের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত স্বদেশ-প্রিয়তা সূচিত হয়।

সর্বপ্রকার মায়া-মোহ ত্যাগ করে স্বদেশ-মুক্তির সন্ত্রাসী বিপ্লবে আত্মোৎ-সর্গের শপথ বিপ্লবী দীক্ষার অগ্নিমন্ত্র। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীদের নারীর প্রতি মোহ কিম্বা বিয়ে নিষিদ্ধ। কিন্তু জাহাঙ্গীর তার বিপ্লবী মন্ত্রের অন্যতম দ্বিতীয় শর্ত রক্ষায় ব্যর্থ হয়। কলেজ-জীবনের মেসের বন্ধু হারুনের সঙ্গে তার গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে ঘটনাচক্রে হারুনের পাগ্‌লাটে মায়ের নিমিত্ত জাহাঙ্গীর হারুনের রূপসী বোন তহমিনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ঘটনাক্রমে নিজের দুর্বলতায় জাহাঙ্গীর নিজে ভ্রষ্ট হয়ে তহমিনাকে ভ্রষ্টা করে এবং তার অগ্নিমন্ত্রের শপথ থেকে বিচ্যুত হয়। অতঃপর কাহিনীর সন্ত্রাসী তৎপরতার পাশাপাশি অনুতাপ-দগ্ধ জাহাঙ্গীর এ-ঘটনাকে তার স্বভাবে গুপ্ত পিতার কামাতুর আত্মার বহিঃপ্রকাশ মনে করে নিজেকে অত্যন্ত নীচাশয় ও অভিশপ্ত ভেবে জীবন সম্পর্কে হতাশ-গ্রস্থ হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে পুলিশী তৎপরতায় তাদের দলের সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম প্রকাশিত হয়ে পড়ে, দলের নেতৃস্থানীয় সকলেই ধরা পড়ে যায়। পূর্ব-পরিচিত চম্পা-সহ আরব্ধ সন্ত্রাসী কর্মের দায়িত্ব-প্রাপ্ত, অস্ত্রসহ পলায়মান জাহাঙ্গীর ট্রেনে চম্পার কাছে তার অনুতাপ-বিদ্ধ চিত্তের যন্ত্রণা প্রকাশ করে মুক্ত হতে চায়, নিজের অস্থিরতা প্রকাশ করে। চম্পার সহানুভূতি ও হৃদগত ভাব বুঝে

জাহাঙ্গীর তার কাছে আত্ম-সমর্পণ করে, চম্পাও জাহাঙ্গীরের প্রতি তার ভালবাসার কথা প্রকাশ করে। এ-সময় জাহাঙ্গীরকে প্রবোধ দিয়ে বিপ্লবী অগ্নি-মন্ত্রে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে চম্পার উক্তিতে কুহেলিকা উপন্যাসে কাজী নজরুলের তৃতীয় ও সর্বশেষ উদ্দেশ্য বিপ্লবী-মন্ত্রের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি আভাষিত হয়, "বিশেষ করে তোমাদের অগ্নি-পন্থীদের মনে যে ভীষণ পশু রয়েছে—তারই প্রেরণায় তোমরা হত্যা করতেও ভয় পাওনা। সে শুধু হত্যার জন্যই নয়—অন্য কারণেও তো জেগে উঠতে পারে। তোমাদের মনের পশুকে একেবারে মেরে ফেললে তোমাদের দেবত্ব বা মনুষ্যত্ব দিয়ে আর যাই হোক—আমাদের যে মন্ত্র, যে সাধনা তার কিছু হবেনা।"[২৬] চম্পার উক্তি আরো তাৎপর্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে উজ্জীবিত জাহাঙ্গীরের উত্তরে—"আগুনের আকুল তিয়াসা ত মিটিবার নয়। তৃষ্ণা কেবল বেড়েই চলবে। পশুর পশু-জন্ম সার্থক হয় দেবীর বেদী-তলে তার বলিদান হয়ে গেলে।...জীবনে কাউকে ভালোবাসিনি, কারুর ভালোবাসা পাইনি, আজ যখন তা'ও পেয়ে গেলুম দৈববলে—তখন এ আমি বেঁচে গেলুম।...আমি আমার কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছি চম্পা, তোমাকে মা'র হাতে সঁপে দিয়ে—যে তুফান উঠেছে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব, প্রমত্তদার মত।"[২৭] সহজেই বোধগম্য, নারীর পবিত্র প্রেমের উদ্দীপনা-শক্তি ব্যতীত বিপ্লবী সংগ্রামের সফলতায় নজরুলের বিশ্বাস ছিলনা। কুহেলিকা উপন্যাসের অধঃপতিত নায়ক জাহাঙ্গীরের চরিত্রের ক্রম-বিবর্তন ও আত্ম-মুক্তির মধ্য দিয়ে নজরুল ইসলাম এ-সত্যই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-মুক্ত স্বদেশ-প্রেমের মানবিক মহিমা এবং নারীর পবিত্র, নির্মল প্রেমের উদ্দীপনা-শক্তি ব্যতীত কেবল বিপ্লবী আত্মত্যাগই নয়, কোন আন্দোলনই স্বাধীনতার জন্য ফলদায়ক ও অর্থবহ হবেনা।

কুহেলিকা উপন্যাস বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের পটভূমিতে রচিত—এ-সম্পর্কে সমালোচকদের দ্বিমত নেই। বর্তমান প্রবন্ধের ইতিপূর্বের আলোচনাও অনুরূপ দৃষ্টিতে করা হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপ্লবী পটভূমিতে রেখে বিচার করলে কুহেলিকা উপন্যাসের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষযোগ্য হয়ে উঠে। আর উক্ত দৃষ্টিতে বিচারও নজরুলের কুহেলিকা উপন্যাসের জন্য সুবিচার হয় বলে মনে হয়না। কুহেলিকায় ঔপন্যাসিক অনেক ঘটনার সমাবেশ

ঘটিয়েছেন, অনেক কথা বলতে চেয়েছেন, অনেক কথা বলেছেনও, যা বিপ্লবের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং বিপ্লবকেই উপন্যাসের প্রধান বিষয় বলে বিবেচনা করলে মনে হবে কাহিনীর ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে, বিন্যাস বিস্রস্ত হয়েছে, গতি ব্যাহত হয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাহিনী অনুধাবন করলে মনে হবে, বিপ্লব কুহেলিকা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ নয়। মনে হবে, বিপ্লব উপন্যাসের কেন্দ্রীয় আবেগের সুষ্ঠু ও সার্থক পরিণতির একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্মর্তব্য, উপন্যাসের কুহেলিকা নামও বিপ্লবের সঙ্কেতবহ নয়। কুহেলিকার প্রধান বিষয়, কেন্দ্রিক আকর্ষণ, ঔপন্যাসিকের উদ্দিষ্ট নায়ক জাহাঙ্গীর, জাহাঙ্গীরের চরিত্র, বিপ্লব নয়। বিপ্লব, অন্তর্ঘাত ও বহিস্থ ঘটনায় ক্ষত-বিক্ষত জাহাঙ্গীরের অভিশপ্ত জীবনের একটা অর্থপূর্ণ পরিণতির জন্য অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কিন্তু সব নয়। স্বভাবে নিরাসক্ত, উদাসীন জাহাঙ্গীর স্কুল জীবনের কোন শৈশবে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল, অতঃপর পিতার মৃত্যু, জারজ-জন্মের আত্মবিনাশী সংবাদ, উদভ্রান্ত, অধঃক্ষিপ্ত মেস ও কলেজ-জীবন, বন্ধু হারুনের বোনের সঙ্গে ইচছার বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত ভাবে জড়িয়ে পড়া পর্যন্ত বিপ্লবী তৎপরতার যেমন কোন উল্লেখ নেই, জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগের কথাও নেই। বিভ্রান্ত ও বিমূঢ়-চিত্তে হারুনদের বাড়ী থেকে ফেরার পথে শিউড়ি স্টেশনে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপ্লবী গুরু প্রমত্তদার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ এবং এই প্রথম বিপ্লবী তৎপরতায় তার অংশগ্রহণ। প্রমত্তর সঙ্গে ঘটনাচক্রে সাক্ষাৎ না হলে এ-সম্ভাবনাও ছিলনা। কিন্তু ততক্ষণে বিপ্লব নয়, জাহাঙ্গীরের জীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের ঘটনাবলী তার ক্রান্তিসীমা অতিক্রম করে গেছে। অতঃপর আর মাত্র দু'বার এই শিউড়ি-কলকাতা রেল-পথে জাহাঙ্গীর বিপ্লবী তৎপরতার সংস্রবে আসে এবং প্রতিবারই স্বীয় জীবন সন্ধিক্ষণের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অনিবার্য প্রয়োজনে মায়ের সঙ্গে হারুনদের বাড়ীতে যাওয়া এবং ফেরার পথে সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে সন্ত্রাসী তৎপরতার সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সংযোগ ঘটে, কোন পূর্ব সঙ্কেত বা নির্দেশ অনুসারে নয়। লেখক কিম্বা জাহাঙ্গীরের পক্ষ থেকে তেমন কোন আভাস উপন্যাসে নেই। দ্বিতীয় বারের সংস্রবে বিপ্লবী তৎপরতার তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নেই। তৃতীয় ঘটনা জাহাঙ্গীরের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তারপূর্বে বিক্ষত-চিত্ত বিক্ষিপ্ত জাহাঙ্গীর তহমিনার সঙ্গে ভ্রষ্ট হয়ে নিজের মধ্যে পিতৃ-পাপের অস্তিত্ব

অনুভব করে হতাশ-ব্যঞ্জক আত্ম-বিনাশের পথে আরো এক ধাপ নিপতিত হয় এবং মা, তহমিনা, হারুনের মাতা-পিতাসহ কলকাতা ফেরার পথে অন্তর্যাতনায় ক্ষত-বিক্ষত, বিধ্বস্ত জাহাঙ্গীর সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় শেষ বারের মত সন্ত্রাসী তৎপরতার সঙ্গে বিজড়িত হয়। অতঃপর ঘটনা অতি-দ্রুত অগ্রসর হয়ে উল্কার বেগে জাহাঙ্গীরের জীবন-বিমুখ, নিঃস্পৃহ, অভি-শপ্ত জীবনকে এক অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যায় এবং চম্পার পবিত্র প্রেমের স্পর্শে, স্বদেশ-প্রেমের মন্ত্রে, পিতৃপাপে বিনাশিত, তহমিনার সান্নিধ্যে বিধ্বস্ত, আত্মবিনাশে উন্মুখ জাহাঙ্গীর জীবন-মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গের মহান ব্রতে উজ্জীবিত হয়ে উঠে। এ-ভাবে জাহাঙ্গীরের জীবনকে উপ-ন্যাসের কেন্দ্রিত মূল বিষয়-রূপে বিবেচনা করলে কুহেলিকা উপন্যাসের কোন ঘটনা, বক্তব্য, বর্ণনা কেন্দ্রীয় বিষয়ের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট, বিস্রস্ত বলে মনে হবেনা, এমন কি হারুনের গ্রামের বাড়ী যাওয়ার পথে গ্রাম-প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ, ভাব বিলাসী, প্রেমের বিমূর্ত বেদনায় উদাসীন ভাবাবেশ নয় এবং কাহিনী শ্লথ-গতিতে অগ্রসর হয়েছে বলেও মনে হবেনা। কেননা উদাসীন, উল্ ঝুলুল জাহাঙ্গীরের অবৈধ জীবনের অভিশাপ-মুক্তি কিম্বা আত্ম-মুক্তির ইতিবৃত্তই উপন্যাসের—ঔপন্যাসিকের প্রধান উদ্দেশ্য। আসলেই নারী কুহেলিকা, দুর্বোধ্য। তার সান্নিধ্যে, প্রেমের স্পর্শে পুরুষ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, আবার তারই প্রেমের স্পর্শে পুরুষের জীবন মহান সত্যে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। জাহাঙ্গীরের জন্ম-রহস্য থেকে দ্বীপান্তর পর্যন্ত ঘটনাবলীর প্রবাহে এ-মহান সত্যই কুহেলিকা উপন্যাসের অন্তর্বাণী। এ-ভাবে বিবেচনা করলে কুহেলিকা কাজী নজরুলের একটি সার্থক সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নজরুলের উপন্যাস-চিন্তা তাঁর রোমাণ্টিক ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। তাই স্থান-কাল, কাহিনীর বিষয় স্বতন্ত্র হলেও তাঁর তিনটি উপন্যাসের নায়ক চরিত্রই ব্যক্তি-স্বভাবের দিক থেকে প্রায় অভিন্ন। প্রতিটি চরিত্রই তার একান্ত মনের দিক থেকে কোন দূরগামী বেদনায় উদাসীন, কেমন বিবাগী—একটু রোমাণ্টিক, দুঃস্থ মানুষের দুঃখ-কষ্টে ক্লিশিত, দুর্গত মানবতার বেদনায় উৎকণ্ঠিত এবং কোন মহান কল্যাণে উৎসর্গিত-প্রাণ, প্রতিটি চরিত্রই শেষ পর্যন্ত নারী-প্রেম-মোহমুক্ত। প্রকৃত পক্ষে, প্রতিটি চরিত্রই নজরুলের রোমাণ্টিক দ্বৈত-ভাবাদর্শের অনুরাগে উৎসৃষ্ট। ফলে কাজী নজরুল ইসলামের মানবতাবাদী রোমাণ্টিক কবি-আত্মা এবং

জীবন-দৃষ্টি, একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম—মৃত্যুক্ষুধার প্রথমার্ধ ব্যতীত, প্রায় অভিন্ন।

৬

নজরুল উপন্যাসের আর একটি আকর্ষণীয় দিক তাঁর ভাষা-বৈশিষ্ট্য। তাঁর উপন্যাসের জীবন ও সমাজ-দৃষ্টির মতই তাঁর ভাষাও জীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের মতই জাজ্বল্যমান, অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতায় ঘনিষ্ঠ ও অভিনব। বলাবাহুল্য, নজরুলের প্রথম দুটি উপন্যাস কথ্য-ভাষায় রচিত, কুহেলিকার সংলাপের ভাষা কথ্য। কিন্তু নজরুলের কথ্য-ভাষা প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্-কালে প্রবর্তিত প্রমথ চৌধুরী কিম্বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথ্য-ভাষা নয়। প্রমথ চৌধুরীর কথ্য-ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যতীত বাক্যান্তর্গত অন্যান্য, শব্দ সজ্জনের সাধুভাষা কঠিন সমাস-বহুল সংস্কৃতের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, কেবল নামেই ছিল কথ্য-ভাষা। রবীন্দ্রনাথের কথ্য-ভাষা অবশ্য প্রমথ চৌধুরীর কথ্য-ভাষা থেকে এক ধাপ নেমে এসে প্রাঞ্জল ও আন্তরিকতায় স্বতঃস্ফূর্ত হল, কিন্তু সে-কথ্যভাষা অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের কথ্য-ভাষা নয়, শিক্ষিত সংস্কৃতিবান উচ্চ-মধ্যবিত্তের কথ্য-ভাষা। সে-ভাষায় অশিক্ষিত দুঃস্থজনের জীবনকথা বর্ণনার আন্তরিকতায় ও সংবেদনশীল শৈল্পিক আবেদনে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠে, কিন্তু জীবন্ত হয়ে অনুভূতিকে আলোড়িত করেনা, জীবন-কথার সঙ্গে ভাষার পার্থক্য-হেতু কাহিনীর পাত্র-পাত্রীকে পরিচিত জগতের চেনা মুখ বলে মনে হয়না। কাজী নজরুল ইসলামই প্রথম ঔপন্যাসিক যিনি অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, অশিক্ষিত, নিম্নস্তরের দুঃস্থ মানুষের জীবন-কথার সাথে তার প্রাত্যহিক জীবনের ভাষাকেও শৈল্পিক মর্যাদায় সাহিত্যের উপযোগী করে তোলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর মৃত্যুক্ষুধা উপান্যাসের প্রথম পরিচেছদ দ্রষ্টব্য। কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বে উনিশ শতকের শেষার্ধের প্রথম পাদে প্যারীচাঁদ মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ সাধারণের ভাষায় সাহিত্য-চর্চার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সুধী-ব্রাহ্মণ সমাজের বিরোধিতার মুখে তাদের সে-প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কাজী নজরুল ইসলাম যে বাংলা সাহিত্যের কৃত্রিম গদ্য-রীতির প্রতি আস্থাবান ছিলেন না এবং মনের ভাব প্রকাশের একটা সহজ-সাধ্য ভাষার অন্বেষণ করছিলেন, বাঁধনহারা উপন্যাসের মনুয়রের এক পত্রে তার আভাস পাওয়া যায়—"ও রকম 'সততসঞ্চরমান নবজলধর পটলসংযোগে' বা

'ক্ষিত্যপতেজো পটাকদুম' ভাষা আমার একেবারেই মনঃপুত নয়। পড়তে পড়তে হাঁপানী আসে, আর কাছে অভিধান খুলে রাখতে হয়।...আমারও এ বিকট রচনাভঙ্গী অনেকেরই বিরক্তিজনক, এমন কি অনেকে একে 'ফাজ-লামি' 'বাঁদরামি' বলেও অভিহিত করতে পারেন কিন্তু আমার এ হাল্কা ভাবের কথা—হাল্কা ভাষাতেই বলা আমি উচিত বিবেচনা করি।"[২৮] বাঁধনহারার ভাষা উত্তম-পুরুষে লেখা পত্রের ভাষা, স্বভাবতই সে-ভাষা আন্তরিকতায় প্রাঞ্জল ও সহজ হওয়ার কথা এবং হয়েছেও তাই। কিন্তু তবু মনে হয়, নজরুল তাঁর কথা বলার উপযোগী সহজ ভাষা বাঁধনহারায় আবিষ্কার করতে পারেন নি। অনেক পরে মৃত্যুক্ষুধায় দুঃস্থ মানুষের কথা বলতে গিয়ে নজরুল তাঁর ভাব-প্রকাশের সহজ ভাষা খুঁজে পেয়েছেন এবং দুঃস্থ, অশিক্ষিত জনের জীবন-কথা দুঃস্থ মানুষের ভাষায় শিল্প-সঙ্গত সাহিত্যরূপ প্রদানে বিস্ময়কর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নজরুলের ভাষা আবেগ-প্রবণ বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু খেটে-খাওয়া দিন-মজুরের আবেগহীন, নিস্তরঙ্গ জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে নজরুল বিস্ময়কর ভাবেই যেমন সংযত তেমন বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নের উদ্ধৃতাংশ দুটি লক্ষ্যযোগ্য :

১. "বিধাতার দেওয়া ছেলেমেয়ে এরা বিধাতার হাতেই সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পান্তা ভাত খেয়ে মজুরিতে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে এসে বড় ছেলেটাকে বেশ করে দু-ঘা ঠেঙায়, মেজোটাকে সম্বন্ধের বাছ্-বিচার না রেখে গালি দেয়, সেজোটাকে দেয় লজঞ্চুস, ছোটটাকে খায় চুমো, তারপর ভাত খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমায়।"[২৯]

২. "গজালের মাকে আর বলবার অবসর না দিয়ে হিড়িম্বা তার পিতলের কলসীটা খং করে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে, অঙ্গ দুলিয়ে, থ্যাবড়ানো গোবরের মত মুখ বিকৃত ক'রে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "তা বলবি বই কিলা স্থুটঁকি! ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়ীর হারাম-বাঁধা পয়সা খেয়ে চেক্নাই বেড়েছে কি না?"[৩০] খেটে-খাওয়া দিন-মজুরের দৈনিক জীবনের এত বাস্তব চিত্র তাদেরই ভাষায় এত সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে এত সংক্ষেপে তুলে ধরার এমন অসাধারণ দক্ষতা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম। এই কথ্য-ভাষাই যে রোমাণ্টিক অনুভবের কাব্যিকতায় কত মাধুর্য-মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে তার পরিচয় এই চরণ ক'টিতে অনুভবনীয়—"পূর্ববঙ্গের মত একেবারে নিরবকাশ

গাছ-পালার ভিড় নাই। খানিকটা মাঠ, খানিকটা তেপান্তরের মত শূন্য ডাঙা, খানিকটা বন-জঙ্গল, দূরে দূরে গ্রাম, ক্ষীণাঙ্গী নদী।...এমনি একটি ছোট গাঁয়ে তোমার ঐ বক্কেশ্বর নদীর ধারে যদি আমার একটি কুটীর থাকত, তা'হলে সারাদিন ঐ রাখাল ছেলেগুলোর সাথে গরু চড়িয়েই কাটিয়ে দিতে পারতাম।"[৩১] আবার জীবনের অন্তরঙ্গ বেদনার স্পর্শে, বাস্তবানুগ গাঢ় অনুভূতির মমতায় এ-ভাষার জীবন-ঘনিষ্ঠ নিখুঁত শিল্প-রূপ বিস্ময়কর। অসলে এ দুঃস্থজনের ভাষার উপর নজরুল নিজস্ব একটি স্টাইল আয়ত্ত করেছিলেন। সে-স্টাইল বিষয় বা ভাবের স্বভাব বুঝে কখনো ঋজু-শাণিত, কখনো কাব্যিকতায় মাধুর্য-মণ্ডিত, কখনো বা বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, কখনো বা বাস্তবতায় নিরেট, আবার কখনো বা বেদনায় করুণ, মর্মস্পর্শী। তবে সব অবস্থায়ই তার ভাষাভঙ্গি সহজ আবেদনে চিত্তাকর্ষক। নিম্নের উদ্ধৃতাংশগুলোতে তার কিছু পরিচয় লক্ষযোগ্য—

১. মেজোবৌ সেজোর রোগ শিয়রে সারারাত জেগে বসে থাকে। কেরোসিনের ডিবে ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করে করে ক্লান্ত হয়ে নিবে যায়। অন্ধকারে বন্ধুর মত জাগে একা মেজবৌ। আর পাথরের মত স্থির হয়ে দেখে, কেমন করে একজন মানুষ আর একজন অসহায় মানুষের চোখের সামনে ফুঁড়িয়ে যায়।[৩২]

২. মেজবৌ-এর রূপ পাড়ার নিত্যকার আলোচনার বস্তু। দুঃখের আগুনে পুড়েও ও সোনা যেন এতটুকু মলিন হয়নি। বর্ষাধোয়া চাঁদনির মত আজও ঠিকরে পড়েছে রূপ। পাড়ার মেয়েরা বলে, 'মাগী রাঁড় হয়ে ষাঁড় হচেছ দিনকে দিন।'

ওর সবচেয়ে বদ অভ্যাস, কারণে অকারণে ও হাসে। অপরূপ সে হাসি—যেন ফুটে ওঠা ফুল হঠাৎ চন্দ্রোদয়।[৩৩]

৩. প্যাঁকালে আর্তকণ্ঠে বলে উঠে, "বড় বউ, কি ভীষণ অন্ধকার! আর সহ্য করতে পারছিনে, বাতি, বাতি কই?"

বড় বৌ তেমনি কান্না-দীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, "বাতি নেই। সব বাতি নিবে গেছে! ঘরে এক ফোঁটা তেল নেই।"

প্যাঁকালে উন্মাদের মত ভাঙা ঘরের চালা থেকে একরাশ পচা খড় টেনে জ্বালিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "তা' হলে ঘরই পুড়ুক।"

সেই রক্ত আলোকে দেখা গেল, প্যাঁকালের মা তার কঙ্কাল আর আবরণ চামড়াটুকু নিয়ে তখনো ধুঁকছে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

প্যাঁকালে 'মা' বলে তার বুকে পড়তেই বৃদ্ধার চক্ষু একটু জ্বলে উঠেই পরক্ষণে নিবে গেল চিরকালের জন্যে!

চালের খড় এখনো ধু-ধু করে জ্বলছে, ওদের বুকের আগুনের মত। একটু পরে অগ্নিশিখাও যেন অতিশোকে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।[৩৪]

বস্তুনিষ্ঠ উপমা-রূপকে, সঙ্কেতে-ইঙ্গিতে, কখনো যমকে-শ্লেষে-উৎপ্রেক্ষায় এ-ভাষা কি চমৎকার ঋজু প্রকাশ-ভঙ্গিতে আশ্চর্য সুন্দর গতিময়তায় জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের প্রায় সর্বত্রই তার পরিচয় লক্ষযোগ্য। ভাষা ও জীবন যেন নিবিড় সখ্যতায় হাত ধরাধরি করে ছুটে চলেছে। আর এ-সখ্যতার বন্ধনই ত্রিশোত্তর আধুনিক কথা-সাহিত্যের বিজয়-বৈজয়িন্তী। অর্থাৎ, অতঃপর কাজী নজরুলের মৃত্যুক্ষুধার লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অবহেলিত খেটে-খাওয়া কুলি-মজুর শ্রমিকের জীবনকথা তাদের মুখের ভাষায় কথিত হয়ে বাংলা উপন্যাস-শিল্পের কথা-সাহিত্য কি ভাবে গৌরবিত ও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে, সে-ইতিহাস বাংলা কথা-সাহিত্যের পাঠক মাত্রই সম্যক অবহিত। চাঁদ-সড়কের গজালের মা, মেজবৌ, প্যাঁকালের দুঃখের সোনার সংসারের বিষাদান্তক ইতিবৃত্ত আধুনিক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের কালান্তর-পর্বের অবিস্মরণীয় স্মারণিক সঙ্ঘটনা।

তথ্যসঙ্কেত

১ সুরেশচন্দ্র মৈত্র : কাজী নজরুল ইসলাম : গদ্যের উপন্যাস, মুহম্মদ মজিরউদ্দীন সম্পাদিত 'নজরুল গদ্য-সমীক্ষা', আদিল ব্রাদার্স, জুন ১৯৭৮, পৃ. ৩

২ মুহম্মদ মজিরউদ্দীন (সম্পাদক) : নজরুল গদ্য-সমীক্ষা, পূর্বোক্ত, পৃ. ক

৩ সুশীলকুমার গুপ্ত : নজরুল-চরিতমানস, ভারতী লাইব্রেরী, পৃ. ১৩১, ১২৭

৪ রফিকুল ইসলাম : কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১ লা বৈশাখ ১৩৮১, পৃ. ৪৮-৫০

৫ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৮, পৃ. ২৮১

৬ শাহ আলম চৌধুরী : নজরুল উপন্যাস সমীক্ষা, মুহম্মদ মজিরউদ্দীন সম্পাদিত 'নজরুল গদ্য-সমীক্ষা', ঐ, পৃ. ১৩

৭ ঐ, পৃ. ১৯
৮ সুশীলকুমার গুপ্ত : ঐ, পৃ. ২৪৪
৯ রাজিয়া সুলতানা : কথাশিল্পী নজরুল, মখ্‌দুমী এ্যান্ড আহসানউল্ল্যা লাইব্রেরী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ—১৯৭৫, পৃ. ১৯-২০
১০ সুরেশচন্দ্র মৈত্র : ঐ, পৃ. ২
১১ মুহম্মদ আবদুল হাই : উপন্যাস রচনায় নজরুল, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৯৬০, পৃ. ১১৩-১৪
১২ কাজী নজরুল ইসলাম : বাঁধনহারা, নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ১৯৬৬, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, পৃ. ৫৫৮-৯১
১৩ ঐ, পৃ. ৫৫৩-৫৪
১৪ সুশীলকুমার গুপ্ত : ঐ, পৃ. ১২৭
১৫ কাজী নজরুল ইসলাম : বাঁধনহারা, ঐ, পৃ. ৫৩৯
১৬ ঐ, পৃ. ৬০৬
১৭ রফিকুল ইসলাম : ঐ, পৃ. ১১৫
১৮ ঐ, পৃ. ১৩৪
১৯ ঐ, পৃ. ১৩৪
২০ ঐ, পৃ. ১৩৯
২১ ঐ, পৃ. ১৪১
২২ ঐ, পৃ. ১৪১
২৩ রাজিয়া সুলতানা : ঐ, পৃ. ৩৯
২৪ রফিকুল ইসলাম : ঐ, পৃ. ১৩৪
২৫ শাহ আলম চৌধুরী : ঐ, পৃ. ৩৩
২৬ কাজী নজরুল ইসলাম : কুহেলিকা, ডি. এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা পুনর্মুদ্রণ—১৩৭১, পৃ. ১৬৭-৬৮
২৭ ঐ, পৃ. ১৬৯
২৮ কাজী নজরুল ইসলাম : বাঁধনহারা, ঐ, পৃ. ৫০৮
২৯ ঐ, মৃত্যুক্ষুধা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২
৩০ ঐ, পৃ. ৪
৩১ ঐ, কুহেলিকা, ঐ, পৃ. ৫৬
৩২ ঐ, মৃত্যুক্ষুধা, ঐ, পৃ. ৬৯
৩৩ ঐ, পৃ. ৩২
৩৪ ঐ, পৃ. ১৫৮